



International Journal of Humanities & Social Science Studies (IJHSSS)
A Peer-Reviewed Bi-monthly Bi-lingual Research Journal
ISSN: 2349-6959 (Online), ISSN: 2349-6711 (Print)
Volume-III, Issue-II, September 2016, Page No. 17-32
Published by Scholar Publications, Karimganj, Assam, India, 788711
Website: <http://www.ijhsss.com>

অসমের ক্ষেত্ৰী অঞ্চলের কাৰ্বি ও বোড়ো জনজাতিৰ ঐতিহ্যশ্ৰয়ী জ্ঞান : সমীক্ষানিৰ্ভৰ পৰ্যবেক্ষণ

ৰাজেশ খান

এম. ফিল ছাত্ৰ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভাৰত

ড. সুজয়কুমাৰ মণ্ডল

অ্যাসোসিয়েট প্ৰফেচৰ, লোকসংস্কৃতি বিভাগ, কল্যাণী বিশ্ববিদ্যালয়, কল্যাণী, নদীয়া, পশ্চিমবঙ্গ, ভাৰত

Abstract

The Karbi and Bodo are the important ethnic groups in North-East India and who hold rich and unique traditional knowledge. They are the true ethnic tribal community. In Assam, surrounding area of Khetri of Dimoria block of the district of Kamrup (Metro), a large number of Karbi and Bodo people live there. They are involved in many types of cultural expressions, agricultural, indigenous medicinal thought etc. which are related to traditional knowledge and this generally has been passed on from generation to generation. Traditional knowledge generally refers to traditional knowledge systems embedded in the cultural traditions of regional, indigenous, ethnic groups or local communities. It includes different types of knowledge about traditional technologies of subsistence (e.g. tools and techniques for hunting or agriculture), folk medicines, traditional preservation techniques of different materials and ecological knowledge etc. The Karbi and Bodo are preserving their own traditional knowledge in terms of daily life practices. It is used among those ethnic people as a part of their culture and it is most significant and important aspect of Bodo and Karbi people. In this paper, we have documented the traditional knowledge and discussed on different types of traditional techniques among the Bodo and Karbi people of Khetri are.

Key Words: *Karbi, Bodo, Traditional Knowledge, Folk Medicine, Preservation.*

১. ভূমিকা : উত্তৰ-পূৰ্ব ভাৰতৰ ঐতিহ্যশ্ৰয়ী জনজাতিদেৱ মध्ये কাৰ্বি ও বোড়ো জনজাতিদয় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যে ভাবৈশ্বৰ্যময়। ভাৰতৰ উত্তৰ-পূৰ্বাংশৰ অন্যতম ৰাজ্য হল অসম। এই ৰাজ্যে অন্যান্য জনজাতিৰ পাশাপাশি কাৰ্বি ও বোড়ো জনজাতিৰ মানুষেৰ বসবাস রয়েছে। কাৰ্বি ও বোড়ো—এই দুই জনজাতিৰ অন্তৰ্গত মানুষেৰা তাৰেৰ ভাবৈশ্বৰ্যময় সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য-ধাৰাকে বংশপৰম্পৰায় বহন কৰে চলেছে। ঐতিহ্যগত ধাৰাৰ একটি সজীব শাখা হল ঐতিহ্যময় জ্ঞান বা ঐতিহ্যশ্ৰয়ী জ্ঞান বা *Traditional Knowledge*। অসমৰ ডিমোৰিয়া ব্লকেৰ অন্তৰ্গত ক্ষেত্ৰী অঞ্চলেৰ কাৰ্বি ও বোড়ো জনজাতিৰ ওপৰ ক্ষেত্ৰসমীক্ষাৰ মাধ্যমে তাৰেৰ সংস্কৃতিৰ বহুমুখী চলনকে তুলে ধৰা সম্ভব। এৰ মধ্যে বিশেষ কৰে বলতে হয় ঐতিহ্যশ্ৰয়ী জ্ঞানেৰ কথা। ক্ষেত্ৰী এলাকাৰ কাৰ্বি ও বোড়ো জনজাতিসমূহ খাদ্য প্ৰস্তুতকৰণ থেকে শুৱ কৰে, পানীয় সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ, জ্বালানী সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ,

দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গৃহনির্মাণ শৈলী, পশু শিকার, কৃষিকাজ — বিভিন্ন ক্ষেত্রে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের ধারাকে লালন-পালন করেছে। কার্ভি এবং বোড়ো জনজাতির দৈনিক জীবনাব্যাসকে সরাসরি পর্যবেক্ষণ সাপেক্ষ, তাদের মধ্যে প্রচলিত উল্লিখিত ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানকে এ নিবন্ধে বহুকৌণিক দিক থেকে বিচার ও বিশ্লেষণ করা হয়েছে।

২. ক্ষেত্রী অঞ্চলের কার্ভি ও বোড়ো জনজাতিদ্বয়ের সংক্ষিপ্ত পরিচয় : অসমের আর্থ-সমাজ-সাংস্কৃতিক পরিকাঠামো সমৃদ্ধ হয়েছে বিভিন্ন সম্প্রদায়ের সহাবস্থানমূলক বসতি স্থাপনের ফলে। ভাষা, ধর্ম নির্বিশেষে বিভিন্ন জাতি উপজাতির সংমিশ্রণ ও সমন্বয় প্রক্রিয়ায় বৃহত্তর অসমিয়া জাতির বর্তমান রূপ পরিলক্ষিত হয়। আর এই রূপ পরিগ্রহ করেই সংগঠিত অসমিয়া জাতিসত্তা। ব্রিটিশ শাসনাধীন ভারতবর্ষে চা চাষ প্রসারের জন্য বাংলা, বিহার, ওড়িশ্যা, মধ্যপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ বিভিন্ন স্থান থেকে নানাবিধ উপজাতি সম্প্রদায়কে চা-শ্রমিক হিসেবে নিযুক্ত করা হয়। এদের মধ্যে তাঁতি, মুণ্ডা, কুর্মি, কোল, খেরিয়া, সাওরা, সবর, ওরাওঁ, কার্ভি, তিওয়া এবং সাঁওতাল— এইসব জনজাতিগোষ্ঠী অসমিয়া সমাজের অঙ্গীভূত হয়ে অসমিয়া সংস্কৃতিকে সমৃদ্ধ করেছে। আমাদের আলোচ্য বিষয় কার্ভি ও বোড়ো জনজাতিদ্বয়। তেজাল টেরনের মতে কার্ভি জনজাতি মঙ্গোলীয় নৃ-গোষ্ঠীর চিনা-তিব্বতি শাখার অন্তর্গত। এদের ভাষা তিব্বতী-বর্মী ভাষা বংশজাত।^১ অন্য দিকে বোড়ো জনজাতি, উত্ত-পূর্ব ভারতের অসম রাজ্যের অন্যতম জনজাতি, প্রাচীন ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসিন্দা। অসমের সামগ্রিক জনজাতির (Tribe) নিরিখে প্রায় চল্লিশ শতাংশ বোড়ো জনজাতি। জনসংখ্যার নিরিখে বোড়ো জনজাতির পরেই কার্ভিদের অবস্থান।

অসমের কামরূপ (মহানগর) জেলার ডিমোরিয়া ব্লকের এবং ক্ষেত্রী এলাকা অধিনস্ত শান্তিপুর, বড়ধুলিয়া এবং তেতেলিগুড়ি গ্রামে আমরা সমীক্ষা কার্য সম্পন্ন করি। লোকসংস্কৃতির বিভিন্ন উপাদানে সমৃদ্ধ এই অঞ্চলটি। এখানে দু'টি জনজাতির অন্তর্ভুক্ত মানুষের আধিক্য পরিলক্ষিত হয়, যেমন- বোড়ো এবং কার্ভি। শান্তিপুর গ্রামে প্রায় ১৫০ ঘর বোড়ো জনজাতির বসবাস। গ্রামটি ডিমোরিয়া উন্নয়ন পরিষদের টোপাতলী (৬৩ নং) পঞ্চায়েতের অন্তর্গত। অন্য দিকে তেতেলিগুড়ি কার্ভি সম্প্রদায় অধ্যুষিত এলাকা। এখানে প্রায় ৮০-৯০ ঘর কার্ভি পরিবার বসবাস করে। কার্ভি মহিলারা তাঁত বোনায় বিশেষ পারদর্শী। বড়ধুলিয়া গ্রামে ঢুলিদের বসতি বেশি। এরা কার্ভি জনজাতির অন্তর্ভুক্ত। সমীক্ষাক্ষেত্রে গিয়ে কার্ভি এবং বোড়ো জনজাতিদের ওপর সমীক্ষা চালিয়ে বহুকৌণিক দিক থেকে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞান সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে।

৩. অনুসৃত তত্ত্ব ও পদ্ধতি : অসমের কামরূপ জেলার ডিমোরিয়া ব্লকের ক্ষেত্রীর পার্শ্ববর্তী এলাকায় ৩ এপ্রিল ২০১৬ থেকে ৯ এপ্রিল ২০১৬ পর্যন্ত সমীক্ষাকার্য সম্পন্ন করি। উদ্দিষ্ট জনজাতি (Target Group) হিসাবে আমরা সামনে রেখেছিলাম কার্ভি, তিওয়া এবং বোড়ো জনজাতিদের। তথ্য সংগ্রহের জন্য আমরা পর্যবেক্ষণ, সাক্ষাৎকার পদ্ধতি এবং প্রয়োজন মারফিক কেস স্টাডির সাহায্য নিয়েছি। পর্যবেক্ষণ পদ্ধতিতে আমরা সরাসরি সংগঠিতভাবে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণ করেছি। আর সাক্ষাৎকার নেবার সময় সংগঠিত এবং অসংগঠিত দু'ধরনেরই সাক্ষাৎকার নেওয়া হয়েছে। সাক্ষাৎকারকালীন প্রশ্ন করা হয়েছিল বদ্ধপ্রান্ত এবং মুক্তপ্রান্ত দু'ধরনের প্রশ্ন। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য আমাদের এই সমীক্ষা দু'ভাবে সংগঠিত করা হয়। যেমন— জনজাতির ঘরে ঘরে গিয়ে, যেখান থেকে আমরা জনজাতির ধারাবাহিক প্রবাহিত জীবনধারাকে চাক্ষুস দেখতে পেয়েছি, যাকে আমরা বলতে পারি 'Actual setting of daily life'। আর তাদের যে অভিকরণমূলক শিল্প আছে, সে সম্পর্কে যথাযথ তথ্য সংগ্রহের জন্য উক্ত পরিবেশে, আরোপিত অবস্থা সৃষ্টি করে তাদের শিল্প সুষমাকে প্রদর্শন করানোর ব্যবস্থা করা হয়। যদিও এই বিষয়টি আলোচ্য প্রবন্ধের আলোচনার বিষয় নয়। ঐতিহ্যশ্রয়ী লোকায়ত জ্ঞান, প্রযুক্তি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে তথ্য নেবার জন্য উদ্দেশ্যমুখীনভাবে তাদের কাছেই গিয়েছি, যারা এই বিষয়গুলি সম্পর্কে অবগত।

৪. ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞান (Traditional Knowledge) : কার্ভি ও বোড়ো জনজাতিগণ বংশপরম্পরাগতভাবে দেশীয় জ্ঞানের রক্ষক। জনজাতিদ্বয়ের দৈনিক জীবনাত্যাসকে পর্যবেক্ষণ করলে দেখা যাবে যে, দৈনন্দিন ব্যবহারের প্রায় প্রত্যেকটি ক্ষেত্রেই এরা ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে থাকে। যেমন— খাদ্য প্রস্তুতিকরণ, পানীয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গৃহনির্মাণ শৈলী, পশু শিকার, কৃষিকাজ ইত্যাদি— বিভিন্ন ক্ষেত্রে জনজাতি সমূহ ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানকে অবলম্বন করে। আলোচনার সুবিধার্থে আমরা সেগুলিকে কয়েকটি ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। যেমন —

১. সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রণালী
২. গৃহনির্মাণ শৈলী
৩. ঐতিহ্যশ্রয়ী শিকার পদ্ধতি
৪. কৃষিকাজ সম্পৃক্ত ঐতিহ্যজ্ঞান
৫. পরম্পরাগত লোকচিকিৎসা প্রণালী ও লোকঔষধ ইত্যাদি।

৪.১. সংগ্রহ ও সংরক্ষণ প্রণালী : খাদ্য, পানীয় জল, খাদ্যশস্য, জ্বালানী ইত্যাদি দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করতে উপজাতি সমূহ ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানকে কাজে লাগায়। এই সংক্রান্ত সমীক্ষাপ্রাপ্ত যে উপাদান পাওয়া গিয়েছে তাকে এভাবে শ্রেণিবিন্যাস করা যায়:

১. খাদ্যবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
২. পানীয়-জল সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
৩. জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ
৪. দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৪.১.১. খাদ্যবস্তু সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : খাদ্যবস্তু ভবিষ্যতের ব্যবহারের জন্য সংরক্ষণ করে রাখার রীতি বহু প্রাচীন কালের। তবে আধুনিকতার ছোঁয়ায় তার অনেক পরিবর্তন এসেছে। কিন্তু জনজাতিরা এখনও সনাতন পদ্ধতি বা ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের (Traditional Knowledge) ওপর নির্ভর করে খাদ্যবস্তু প্রস্তুত এবং সংগ্রহ ও সংরক্ষণ করে। যেমন— মাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, পাটপাতা সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, সুপারি সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ ইত্যাদি।

৪.১.১.১. মাছ সংগ্রহ ও সংরক্ষণ : খাদ্য সংরক্ষণের এক প্রাচীন পদ্ধতি হল খাদ্য রোদে শুকানো। মাছও রোদে শুকিয়ে সংরক্ষণ করা হয়। মাছকে রোদে রাখা হয় জল অপসারণের জন্য। মাছের দেহে যে জল বর্তমান থাকে তা মাছ পঁচনে সহায়তা করে। খোলা জায়গায় বাতাস এবং রোদ ব্যবহার করে মাছকে শুকানোর প্রথা অনেক প্রাচীন কাল থেকেই চলে আসছে। বোড়ো ও কার্ভি জনজাতিরাও তাই করে। মাছের দেহের জলের পরিমাণ কমে গেলে ব্যাকটেরিয়া বা অন্যান্য অণুজীবসমূহ জন্মাতে বা বৃদ্ধি পেতে পারে না। ফলে মাছ ভালো থাকে।

প্রথমে মাছকে ভালো করে ধুয়ে লবণ জলে কিছুক্ষণ ডুবিয়ে রাখা হয়। পরে জল ঝরানোর জন্য বাঁশের তৈরি চাটাই বা চালুনি বা মাদুরের ওপর মাছগুলো বিছিয়ে সূর্যালোকে শুকানো হয়। বোড়ো ভাষায় চালুনিকে বলা হয় ‘সান্দ্রী’। প্রথমে রোদে দু’তিন দিনের মধ্যে তা শুকিয়ে যায়। এমনটা করা হয় ছোটো মাছের ক্ষেত্রে। বড়ো মাছের ক্ষেত্রে নাড়ি-ভুড়ি ও আঁশসহ দ্রুত পচনশীল অংশ বের করে ফেলে দিয়ে ভালো করে ধোঁয়া হয়। ধারালো ছুরি দিয়ে মাছগুলোকে চেরা হয়। এরপর পূর্বের মতো জল ঝরিয়ে খোলা আকাশের নিচে চাটাই বা চালুনি বা মাদুরের ওপর মাছগুলোকে শুকানো হয়। শুকানো মাছ পলিথিনের ব্যাগে বা প্লাস্টিক বাল্লে সংরক্ষণ করা হয় (চিত্র নং- ১ ও ২)। এমনটা করা হয় মূলত বোড়ো জনজাতির ক্ষেত্রে।^২



চিত্ৰ নং ১ - মাছ সংৰক্ষণ কৰে রাখাৰ পাত্ৰ হাতে বোড়ো ৰমণী ৰোহিণী বোড়ো



চিত্ৰ নং ২ - পলিথিনেৰ প্যাকেটে সং-
ৰক্ষিত মাছ



চিত্ৰ নং ৩ - মাছ সংৰক্ষিত রাখাৰ
পাত্ৰ 'পাব'

কাৰ্বিৰাও অনেকটা ঐ একইভাবে সূৰ্যালোকৰ সাহায্যে মাছ জলশূন্য কৰে। কিন্তু ৰোদে শোকানোৰ পৰ শুকনো মাছৰ মध्ये একধৰনেৰ ক্ষাৰ ও নুন মেশায়। এই ক্ষাৰ তারা তৈরি কৰে কলাগাছৰ গোড়ার অংশ থেকে। কলাগাছৰ গোড়ার অংশ ৰোদে শুকিয়ে তা আঙুনে পোড়ানো হয়। আঙুনে পোড়ালে তা কালো ধৰনেৰ গুড়ো উপাদান তৈরি হয়। আঞ্চলিক ভাষায় একে 'ছাঁয়' বলে। এরপর ঐ ছাঁয়কে নারকেলের 'মালোয়' অর্থাৎ নারকেলের অন্তঃভাগে যে শক্ত অংশ থাকে তার মধ্যে রেখে তাতে জল দেওয়া হয়। পরিণত নারকেল ছাড়ালে এই শক্ত মালোয় পাওয়া যায়। মালোয়ের নিচে একটা ছিদ্র থাকে। ঐ ছিদ্র দিয়ে জল গড়িয়ে নিচে রাখা পাত্ৰে জমা হয়। ঐ জমাকৃত উপাদান হচ্ছে ক্ষাৰ। ক্ষাৰ আৰ নুন জল মাখিয়ে মাছকে একদিন ৰোদে রেখে দেওয়া হয়। মাছগুলি নরম (কাৰ্বি ভাষা- কুমল) হলে তা বাঁশেৰ মध्ये রাখা হয়। এটাকে তাদের ভাষায় বলে 'বাঁশেৰ পাব'। এটা তৈরি করা হয় বাঁশ দিয়ে। বাঁশেৰ দুই গিৰি বা গাটেৰ মধ্যবৰ্তী অংশ কেটে নিয়ে, তার একদিক খোলা রাখা হয়; আৰ একদিক বাঁশেৰ গিৰি দ্বারা বন্ধ থাকে। যে মুখ খোলা থাকে সেদিক দিয়ে ঐ মাছগুলি শক্ত কাঠি দ্বারা ঠেসে ঠেসে বা টিপে টিপে 'বাঁশেৰ পাবে' প্ৰবেশ কৰানো হয় (চিত্ৰ নং- ৩)। পাবেৰ সামনেৰ দিকে কিছুটা অংশ ফাঁকা রাখা হয়। ছায়েৰ মণ্ড দিয়ে ঐ ফাকা অংশ পূৰ্ণ কৰা হয়। উল্লেখ্য কলাগাছৰ গোড়ার অংশ পুড়িয়ে যে ছায় প্ৰস্তুত কৰা হয়েছিল, তার সাথে জল মিশিয়ে ছায়েৰ মণ্ড তৈরি কৰা হয়। তবে ঐ মণ্ড বাঁশেৰ পাবেৰ ফাকা অংশে দেওয়ার আগে মাছের ওপরে কলা পাতা দিয়ে দেওয়া হয়, যাতে ঐ ছায় মাছের সাথে মিশে যেতে না পারে। এভাবে সংৰক্ষিত মাছ তিন থেকে চাৰ বছৰ যাবৎ রেখে দেওয়া যায় এবং প্ৰয়োজন মতো তা খাওয়া হয়। কাৰ্বি ভাষায় এই ধৰনেৰ মাছকে 'হিদল' বা 'তমাল' বলে।^৩

৪.১.১.২. পাট পাতা সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ : কাৰ্বি জনজাতিৰ একটা বিশেষ খাদ্য পাটপাতা। এরা পাটপাতাকে শুকিয়ে রেখে বিভিন্ন তৰি-তৰকাৰিৰ সঙ্গে খায়। সাধাৰণত পাটপাতা কাঁচা অবস্থায় রসালো থাকে। যখন এটা সংগ্ৰহ করা হয়, তখন তা কাঁচা থাকে। ক্ষেত থেকে টাটকা তৰতাজা পুষ্ট বা কচি পাতা সংগ্ৰহ করা হয়। বেশিরভাগ পাতা পোকায় কেটে বা পোকা লেগে নষ্ট হয়ে যায়। তাই কেবল মাত্ৰ পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন, পোকায় কাটা নয় এমন পাতাগুলিই চয়ন করা হয়।

পাতা রসালো হবার কারণে তাতে জল থাকে। সে কারণে পাতায় দ্রুত পচন ধরে। তাই পৰিষ্কাৰ পৰিচ্ছন্ন পাতাগুলি ক্ষেত থেকে আনা মাত্ৰ আবার জল দিয়ে ধুয়ে নিয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয়। তা যখন জলশূন্য হয়ে ভালোভাবে শুকিয়ে যায়, তখন তা বিভিন্ন পাত্ৰে রেখে দেওয়া হয়। বেশিভাগ ক্ষেত্ৰে এই শুকনো পাতা পলিথিন প্যাকেট বা প্লাষ্টিক পাত্ৰে রাখা হয় (চিত্ৰ নং- ৪)। এই ধরনের পাত্ৰে হাওয়া বা বায়ু প্ৰবেশ করতে পাবেনা। হাওয়া বা বায়ু পাট পাতাকে খুব তাড়াতাড়ি নরম করে দেয়। তাতে তা খুব তাড়াতাড়ি নষ্ট হয়ে যেতে পারে। দীৰ্ঘদিন ধৰে শুকনো পাট পাতাকে এভাবে রেখে দেওয়া যায়। শুকনো পাতাকে বলা হয় ‘মরা পাতা’। পৰে যখন এই পাতা খাবার ইচ্ছা হয়, তখন তা গৰম জলে ভিজিয়ে ধুয়ে নেওয়া হয়। এককথায় শোধান করা হয়। তাৰপৰ তা তৰকাৰিতে দেওয়া হয়। মূলত ডাল, মাছে এই পাতা বেশি ব্যবহার করা হয়। পাট পাতা দিয়ে যে তৰকাৰি প্ৰস্তুত করা হয় তাকে বলা হয় ‘মরাপাতাৰ অঞ্জা’।^{৪-৫}



চিত্ৰ নং ৪ - পলিথিন প্যাকেটে সংৰক্ষিত পাট পাতা

৪.১.১.৩. সুপাৰি সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ : কাৰ্বিদের সুপাৰি সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ পদ্ধতিটি অসাধাৰণ। সুপাৰি গাছ থেকে পৰিপক্ক সুপাৰি সংগ্ৰহ করা হয়। তাৰপৰ সেই সুপাৰিৰ গায়ে যে চামড়া বা খোসা থাকে তা ছাড়ানো হয়। এৰপৰ তা রোদে শুকিয়ে ব্যবহার করা হয়। এই সমগ্ৰ পদ্ধতিটি কয়েকটি পৰ্যায়ে সম্পন্ন হয়। প্ৰথমে গাছ থেকে কাঁচা অবস্থায় পৰিপক্ক সুপাৰিকে সংগ্ৰহ করা হয়। সুপাৰি পাড়ার সময় লম্বা জাতীয় বাঁশ ব্যবহার করা হয়। তা দিয়েই সুপাৰি পাড়া হয়। এছাড়া সুপাৰি পেকে হলুদ হয়ে গেলে একা একাই পড়ে যায়। এই সুপাৰিগুলি একস্থানে গচ্ছিত রাখা হয়। সংগ্ৰহীত বা গচ্ছিত সুপাৰিকে দা দিয়ে মাঝ বরাবৰ কেটে দু’টুকরো করা হয়। ঐ টুকরো টুকরো সুপাৰিৰ খোসা ছাড়িয়ে রোদে শুকোতে দেওয়া হয় (চিত্ৰ নং- ৫ ও ৬)। আবার কখনো কখনো সংগ্ৰহীত বা গচ্ছিত সুপাৰিকে না



চিত্ৰ নং ৫ - কাৰ্বি ৰমণী ৰম্ভা তেৱন দা দিয়ে সুপাৰী ছাড়াচ্ছে



চিত্ৰ নং ৬ - রোদে সুপাৰি শোকানোৰ কৌশল



চিত্ৰ নং ৭ - কাৰ্বি জনজাতিৰ সুপাৰি রাখাৰ পাত্ৰ

কেটেই রোদে কয়েক দিন শুকোতে দেওয়া হয়। তাৰপৰ খোসা বা খোলস ছাড়ানো হয়। কাৰ্বি ভাষায় এই খোসাকে ‘বাকল’ বলে। ভালো মতো রোদ থাকলে দু’চাৰ দিনেই সুপাৰি শুকিয়ে যায়। যতদিন না ভালোভাবে সুপাৰি শোকায় অৰ্থাৎ সুপাৰিৰ মধ্যে যে জল বা রসালো ভাব আছে তা পুরোপুরি জলশূন্য না হয়, ততোদিন তা রোদ রাখা হয়। শুকিয়ে গেলে তা খাবার জন্য ব্যবহার করা হয়। এই শুকনো অবস্থায় সংৰক্ষণ করে রাখা সুপাৰিকে কাৰ্বি ভাষায় ‘মিঠা তাম্বুল’ বলা হয়। এভাবে দীৰ্ঘদিন যাবৎ কাৰ্বিৰা সুপাৰিকে ভবিষ্যতে ব্যবহারের জন্যে সংৰক্ষণ করে রাখে।^৬

৪.১.১.৪. খাদ্যশস্য ধান সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ : পাহাড়ে মূলত ঝুমচাষ পদ্ধতিতে ধান চাষ করা হয়। বিশেষভাবে উল্লেখ্য বোড়ো ও কাৰ্বি জনজাতিৰা ধানকে দু'ভাবে সংৰক্ষণ করে। এক - খাদ্যশস্য ধানের সংৰক্ষণ এবং অন্যটি হলো বীজ ধানের সংৰক্ষণ। দু'টোৰ পদ্ধতিই পৃথক। আমরা এখানে কেবল খাদ্য শস্য ধান সংগ্ৰহ করে রাখার নিয়ম আলোচনা করবো। কাৰ্বি ও বোড়ো উভই জাতিগোষ্ঠীই ক্ষেত থেকে পাকা ধান সংগ্ৰহ করার পর সেই ধানকে ঝাড়াই করে। তারপর ধানের মধ্যে যে চিটিধান থাকে বা আবৰ্জনা থাকে তা তারা পরিষ্কার করে। এরপর ঐ ধান ৩-৪ দিন ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে কয়েকদিন ঠান্ডা স্থানে রাখে। পরে আবার ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে ঠান্ডা করে উপযুক্ত পাত্রে ও যথাযথ স্থানে সংৰক্ষণ করে। পাত্র হিসাবে ব্যাবহার করা হয় 'ডুলি' (চিত্র নং- ৮)। এই ডুলি বাঁশ দিয়ে তৈরি করা হয়। ডুলির গায়ে গোবর-মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। কেউ কেউ আবার বাঁশের চাটাই দিয়ে চারকোনা ধরণের 'গোলা ঘর' তৈরি করে নেয়। এই গোলা ঘরের গায়েও গোবর-মাটির প্রলেপ দেওয়া হয়। প্রচলিত পদ্ধতিতে মাটির পাত্র, বস্তা, পলিথিনসহ বস্তা, ডোল বা ডুলি ইত্যাদিতে ধান রাখা হয়। বোড়োরা ধান ভাঙ্গানোর আগে ধান সেদ্ধ করে না। এরা কেবল রোদে শুকিয়ে নিয়ে ধান ভাঙ্গায়। এদের প্রধান ফসল ধান। এই একই পদ্ধতিতে গম শস্যও সংগ্ৰহ করে রাখে।^{১-৯}



চিত্র নং ৮ - ডুলিতে সংৰক্ষিত খাদ্য শস্য ধান

৪.১.১.৫. অন্যান্য : বোড়ো সমাজ সিজু গাছকে আরাধনা করে। তাঁরা বিশ্বাস করেন এটি পৃথিবীর আদি গাছ। তাই এই আদিগাছকে তাঁরা আদিদেবতা হিসাবে মান্যতা দেয়। আরাধ্য দেবতা হিসাবে মান্যতা দেবার কারণে এই গাছ তারা কাটে না। সেই জন্য এই সমাজে সিজু গাছ বংশপরাম্পরায় সংৰক্ষিত হয়ে আসছে।^{১০}

৪.১.২. পানীয়-জল সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ : কাৰ্বি ও বোড়োরা সনাতন পদ্ধতিতে জল পরিশুদ্ধ করে পান করে। আমরা সমীক্ষায় এক অভিনব জল শোধনের পদ্ধতির সন্ধান পেয়েছি। উভই জনজাতিৰ লোকেরা নদী-নালা, পুকুর জলাশয় থেকে জল সংগ্ৰহ করে। কেউ কেউ আবার কুয়োর জল পান করে (চিত্র নং- ৯)। কাৰ্বিরা পাহাড়ের ঝর্ণা থেকে জল সংগ্ৰহ করে।



চিত্র নং ৯ - পানীয়-জল সংৰক্ষিত রাখার কুয়ো



চিত্র নং ১০ - পানীয়-জল পরিশোধনের লৌকিক পদ্ধতি

এলাকায় সরকারী নলকূপের প্রচলন রয়েছে। সেখান থেকেও জল সংগ্ৰহ করা হয়। তবে সব জলই পরিশোধন করেই তারা পান করে। তাদের মতে, এলাকায় আর্সেনিকের পরিমাণ বেশি। সে কারণে তারা জল পরিশোধন না

কৰে পান কৰে না। বোড়োৱা জল পৰিশোধনৰ জন্ম লৌকিক পদ্ধতিৰ ব্যৱহাৰ কৰেন। প্ৰথমে কল বা জলাশয় থেকে জল সংগ্ৰহ কৰে কলসি বা টিনে রাখা হয়। ঐ কলসি বা টিনকে একটা উচু স্থানে রাখা হয়। উচু স্থান হিসাবে মূলত বাঁশেৰ তৈৰি মাচা ব্যৱহাৰ কৰা হয়। ঐ কলসি বা টিনেৰ নিচে একটা ছিদ্ৰ থাকে। ঐ ছিদ্ৰ দিয়ে জল চুইয়ে চুইয়ে নিচে পড়ে। পৰিশুদ্ধ জল সংগ্ৰহ কৰাৰ জন্ম নিচে আৰ একটা পাত্ৰ রাখা হয়। ঐ পাত্ৰে জমাকৃত জলই পান কৰা হয়।

কল বা জলাশয় থেকে জল সংগ্ৰহ কৰে কলসি বা টিনে রাখা হয়। ঐ কলসি বা টিনেৰ ভিতৰে জল পৰিশোধনৰ জন্ম কয়েক স্তৰে বালি, নেট, ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ পাথৰ থাকে। ঐ লেয়াৰ বা স্তৰ পেৰিয়েই জল পৰিশুদ্ধ হয়ে নিচে রাখা পাত্ৰে চুইয়ে চুইয়ে জমা হয় (চিত্ৰ নং- ১০)। ঐ জমাকৃত জল পানেৰ জন্ম অন্য পাত্ৰে রাখা হয় এবং সেখান থেকে জল সংগ্ৰহ কৰে পানীয় হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰা হয়। বোড়ো জনজাতিৰ মানুহেৰা এভাবেই পানীয়-জল সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ কৰে।^{১১}

অন্যদিকে কাৰ্বিৰা পাহাড়ৰ বৰ্ণা থেকে পাইপলাইন সংযোগে বাড়িতে জল নিয়ে আসে এবং সেই জল সংগ্ৰহ এবং সংৰক্ষণ কৰে রাখে। যাদেৰ কুয়ো আছে তারা কুয়োৰ জল পান কৰে।^{১২}

৪.১.৩. জ্বালানী সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ : ক্ষেত্ৰী অঞ্চলটি পাহাড় সংলগ্ন। এখানে বনভূমিৰ প্ৰাচুৰ্য লক্ষ্য কৰা যায়। এই অঞ্চলেৰ কাৰ্বি এবং বোড়ো জাতিগোষ্ঠীৰ মানুহেৰা মূলত পাহাড়ী বনভূমি থেকে তাঁদেৰ নিত্য প্ৰয়োজনীয় জ্বালানী সংগ্ৰহ কৰে থাকেন। যারা পাহাড় থেকে সংগ্ৰহ কৰতে অপাৰগ, তারা অন্যদেৰ কাছ থেকে

বা বাজাৰ থেকে জ্বালানী সংগ্ৰহ কৰেন। পাহাড় থেকে আনা গাছেৰ ডাল বা গুড়িকে সুন্দৰভাবে কেটে রৌদ্রে শুকোতে দেয়। জল বা রস নিষ্কাশন হলে সেগুলি গুছিয়ে আঁটি বেধে ঘৰে সুন্দৰভাবে সাজিয়ে রাখে। কখনো কখনো বাঁশেৰ মাচাৰ ওপৰ বা ৰান্নাঘৰে জ্বালানী সুন্দৰভাবে সাজিয়ে রাখে (চিত্ৰ নং- ১১)। এভাবেই বোড়োৱা জ্বালানী সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ কৰে।^{১৩}

কাৰ্বিৰা কাঠ ছাড়াও উলু-খেড় জ্বালানী হিসাবে ব্যৱহাৰ কৰে। কাৰ্বি ভাষায় উলু-খেড়কে ‘ফালাং’ বলা হয়। তবে ‘ফালাং’ দিয়ে ঘৰেৰ ছাউনিও প্ৰস্তুত কৰা হয়। ঘৰেৰ ছাউনি মানে ঘৰেৰ চালাকে বোঝায়। জ্বালানীৰ জন্ম ব্যৱহৃত গাছেৰ ডালকে কাৰ্বি ভাষায় ‘ঠেং’ বলে। জ্বালানীৰ জন্ম ব্যৱহৃত গাছেৰ ডাল এবং বাঁশ সংৰক্ষণ কৰে মাচাৰ ওপৰ রাখা হয়। মাচাটি বাঁশ দ্বাৰা নিৰ্মিত। মাচাকে এদেৰ ভাষায় বলা হয় ‘হোং’ এবং অসমী ভাষায় ‘ছ্যাং’।^{১৪}



চিত্ৰ নং ১১ - বোড়ো জনজাতিৰ ৰান্না ঘৰে সংৰক্ষিত জ্বালানী

৪.১.৪. দৈনন্দিন জীবনে ব্যৱহৃত উপাদান সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ প্ৰণালী : দৈনন্দিন জীবনে ব্যৱহৃত বিভিন্ন উপাদানকে, বোড়ো জনজাতিৰ অন্তৰ্ভুক্ত মানুহেৰা বিশেষ প্ৰক্ৰিয়ায় সংগ্ৰহ ও সংৰক্ষণ কৰে রাখে। বোড়ো জনজাতিৰ ৰান্নাৰ আনাজ-পাতি ৰান্না ঘৰে সংগ্ৰহ কৰে রাখাৰ পদ্ধতি সত্যিই অভিনব। তবে গ্ৰামীণ বাঙালিৰ ৰান্না ঘৰেও এমনটা লক্ষ্য কৰা যায়। বোড়োৱা ৰান্নাৰ আনাজ-পাতি কিভাবে ৰান্না ঘৰে সংগ্ৰহ কৰে রাখে আমাৰ কেবল সে দিকেই আলোকপাত কৰবো।

বাজাৰ থেকে আনা বা নিজেদেৰ চাষ কৰা সজিপাতি বা আনাজপাতি ঘৰেৰ এক কোনায় বা মাচায় রাখা থাকে। মাচা সাধাৰণত বাঁশ এবং কাঠেৰ দ্বাৰা নিৰ্মিত হয়। মাচাৰ কয়েকটি ধাপ লক্ষ্য কৰা যায় (চিত্ৰ নং- ১২)। তাঁদেৰ বিশ্বাস এই মাচায় আনাজ দ্ৰব্য রাখলে অনেকদিন পৰ্যন্ত ভালো থাকে। নিচে অৰ্থাৎ মাটিতে যে আনাজপাতি রাখা

হয়, সেগুলি রাখাৰ আগে মাটিতে বস্তা বা পলিথিন জাতীয় কিছু পেতে রাখা হয়। কাৰণ মাটিৰ রসেৰ সংস্পৰ্শে আনাজ-দ্রব্য বেশিদিন থাকে না। নষ্ট হয়ে যায়।



চিত্র নং ১২ - বোড়ো জনজাতিৰ ৰান্নাৰ আনাজ-পাতি ৰান্না ঘৰে সংগ্ৰহ কৰে ৰাখাৰ কৌশল



চিত্র নং ১৩ - বোড়ো জনজাতিৰ লক্ষা সংগ্ৰহ কৰে ৰাখাৰ পাত্ৰ 'তুকৰি'

লক্ষা এবং পেয়াজ রাখা হয় বাঁশের তৈরি একধরনের ঝুড়িতে। কাৰ্বি ভাষায় একে 'তুকৰি' বা 'ডুখলি' বলে (চিত্র নং- ১৩)। এছাড়া বড়ো বড়ো বাঁশের ঝুড়ি ব্যবহার করা হয় সজিপাতি রাখাৰ জন্য।^{১৫-১৬}

৪.২. গৃহনিৰ্মাণ শৈলী : প্রকৃতির সান্নিধ্যে বেড়ে ওঠা কাৰ্বি এবং বোড়ো জনজাতি প্রকৃতি থেকেই সংগ্ৰহ করা গাঁছ, বাঁশ, শনকে তাদের গৃহ নিৰ্মাণের উপকরণ হিসেবে ব্যবহার করে। বাড়িগুলো মাটি থেকে ৯ থেকে ১২ ফুট পর্যন্ত উঁচু খুঁটি দিয়ে তৈরি করা হয়। খুঁটি বাঁশ এবং গাছের হয়ে থাকে। কাৰ্বি ভাষায় ঘরকে 'ঘর'ই বলে। যেমন ৰান্না ঘরকে বলে 'পাক ঘর' (চিত্র নং- ১৪)। বোড়োদের তৈরি করা ঘর গুলো দেখতে পরিপাটি এবং বেশ সুন্দর। কাৰ্বিদের গৃহনিৰ্মাণ শৈলী দেখতে বেশ নয়নাভিৰাম। ঘরগুলিতে অসংখ্য বাঁশ ও গাছের খুঁটি দিয়ে শক্ত-মজবুত করে তোলা হয়। বড় ও হাওয়ায় যাতে ভেঙ্গে না যায়। ঘরের আকার মোটামুটি বড় মাপের হয়ে থাকে। এঁরা ঘর নিৰ্মাণের জন্য একটির সাথে অন্য একটির নৈকট্য বজায় রাখে। এটি সামাজিক প্ৰীতিবন্ধনের অংশ মনে করে।^{১৭}



চিত্র নং ১৪ - কাৰ্বি জনজাতিৰ ৰান্না ঘৰ



চিত্র নং ১৫ - বোড়োদের বাড়ির চারিদিক বাঁশের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা

বোড়ো জনজাতিৰ গৃহে অসাধাৰণ বাঁশের কাৰুকাৰ্য লক্ষ্য করা যায়। বাঙালিদের মতোই এদের পূৰ্বযুখী ঘর করার প্রচলন রয়েছে। বর্তমানে ঘরে টিনের ব্যবহার করতে দেখা যাচ্ছে। তাছাড়া ইটের তৈরি পাকা ঘরও অমিল নয়। বাড়িতে বিভিন্ন দিকে নানারকম ঘর তৈরি করতে দেখা যায়। যেমন গোয়াল ঘর সাধাৰণত দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে রাখা হয়। বাড়ির চারিদিক বাঁশের তৈরি বেড়া দিয়ে ঘেরা। বেড়াতে বেশ কাৰুকাৰ্য লক্ষ্য করা যায় (চিত্র নং- ১৫)।

কার্বি জনজাতির গৃহেও বাঁশের কাজের আধিক্য বেশি। আসলে ঐ অঞ্চলে বাঁশের প্রতুলতা রয়েছে। সে কারণেই বাঁশ ব্যবহারের আধিক্য। গৃহের ওপরের অংশ অর্থাৎ চালা হয় খড়ের তৈরি। আমরা মূলত কার্বিদের ঐতিহ্যবাহী ঘরের কথা বলছি। বোড়োদের মতো তাদের গৃহ নির্মাণেও আধুনিকতার স্পর্শ লেগেছে। কিন্তু তা সত্ত্বেও বাড়িতে দু-একটা ঐতিহ্যবাহী গৃহ রয়েছে। এঁরা ঘরের বেড়া তৈরি করে বাঁশের চাটাই দিয়ে। বাঁশের চাটাইয়ের ওপর মাটি ও গোবরের প্রলেপ দেয় (চিত্র নং- ১৪)। এতে বেড়া পাকাপোক্ত বা দৃঢ় হয়। টেকসই হয় বেশি। মাটির উচ্চতা থেকে ঘরের ভিত এক থেকে দেড় ফুট উচুতে থাকে। কার্বিরাও ঘর নির্মাণের জন্য একটির সাথে অন্য একটির নৈকট্য বজায় রাখে। এদের ঘরের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল- রান্নাঘর (পাক ঘর) ও ঠাকুর ঘর সবসময় বাড়ির পূর্ব দিকে থাকবে। ঠাকুর ঘরকে কার্বি ভাষায় ‘মুনিকুর’ বলা হয়। শয়ন ঘর সর্বদা পশ্চিম মুখী রাখা হয়। দিক নির্দেশিকা অনুযায়ী ঘর করার প্রথা সংসারের জন্য মঙ্গলকর বলে তারা বিশ্বাস করে। বাড়ির সৌন্দর্য আরোও বাড়িয়ে দেয় প্রায় প্রত্যেক বাড়িতে থাকা একটা করে কুয়ো।^{১৮}

৪.৩. ঐতিহ্যশ্রয়ী শিকার পদ্ধতি : জীবনধারণের জন্য মানব সমাজকে কখনো কখনো শিকার করতে হয়। অনেকের আবার শিকার করা একটা নেশা, আভিজাত্য ভাব প্রকাশের মাধ্যম। আমরা এখানে তাদের কথা বলছি না। আমরা বলছি তাদের কথা, যারা দু’বেলা রুজি রোজগারের জন্য, খাদ্য অন্বেষণের জন্য শিকার করে। কেউ মাছ শিকার করে, কেউ বা হরিণ শিকার। এরা নিজস্ব বা সোনাতন পদ্ধতিতে শিকার করে। জনজাতিদের মধ্যে বন্যপশু-পাখি, হরিণ, মাছ ইত্যাদি শিকার করার প্রচলন রয়েছে। আমাদের আলোচনা কেবল মৎস শিকার পদ্ধতিতেই সীমাবদ্ধ থাকবে।

পূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি যে, বোড়ো ও কার্বি জনজাতির নারী-পুরুষ উভয়েই মাছ শিকারে অংশগ্রহণ করে। বোড়োরা মাছকে বলে ‘না’। সাধারণত নদী-নালা, খাল-বিল, খাড়ি থেকে এরা মাছ সংগ্রহ করে। মাছ সংগ্রহের সময় এরা ‘জাকৈ’ বা ‘জাখৈ’, ‘খোলই’, ‘ডিংগুরি’ ব্যবহার করে। বোড়ো ভাষায় এদের ঐ নামে চিহ্নিত করা হয়। এগুলি হলো মাছ ধরার সরঞ্জাম। কার্বি ভাষায় ‘ডিংগুরি’ কে ‘ডিংগুড়ি’ বলা হয়। মাছ সংগ্রহের সময় কার্বিরাও জাল বা নেট, জাকৈ বা জাখৈ, খোলই ব্যবহার করে। কার্বি ও বোড়ো দু’ই জনজাতির লোকজন মাছ ধরার সময় হাত দিয়েও মাছ ধরে (চিত্র নং- ১৬)।^{১৯}



চিত্র নং ১৬ - মৎস শিকাররত বোড়ো জনজাতির মানুষেরা

৪.৪. কৃষিকাজ সম্পৃক্ত ঐতিহ্যজ্ঞান : কৃষিকাজকে কেন্দ্র করে জনজাতিদের মধ্যে নানাবিধ ঐতিহ্যময় জ্ঞানের প্রচলন রয়েছে। ধানের বীজ কিভাবে সংগ্রহ করে সংরক্ষিত রাখা হয়— কেবলমাত্র এই সংক্রান্ত তথ্যাদির ওপর আমাদের আলোচনা সীমাবদ্ধ থাকবে।

৪.৪.১. ধান বীজ সংরক্ষণের কৌশল : যে ধানের বীজ রাখবে সেই ধানকে বোড়োরা আলাদাভাবে চিহ্নিত করে রাখে। ফসল কাটার পর সেই ধানকে ৩-৪ দিন ভালোভাবে রোদে শুকিয়ে কয়েকদিন ঠান্ডা স্থানে রাখে। এরা যে ধানকে বীজ হিসাবে রাখে তা খুব ভালো এবং পরিপুষ্ট হয়। কারণ আগে থেকেই এঁরা কোন ধানের বীজ রাখবে তা চিহ্নিত করে রাখে। আবার কখনো কখনো ধান ঝাড়াই করার পর ভালো পুষ্ট ধানকে বীজের জন্য আলাদা করে রাখে। খারাপ বা অপুষ্ট ধান বাছাই করে ঝেড়ে ফেলা হয়। বীজ ধানকে এরা ‘আইজং’ বলে। প্রথমবার শোকানোর পর পুনরায় ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে অপেক্ষাকৃত কম উষ্ণ স্থানে রাখা হয়। এরপর ঐ বীজ শস্য উপযুক্ত পাত্রে ও

যথাস্থানে সংরক্ষণ করে রাখে। এখন প্রশ্ন ঐ বীজ কিভাবে সংরক্ষিত থাকে? আমরা এবার সে বিষয়ে আলকপাত করবো। প্রসঙ্গক্রমে জানিয়ে রাখি, কার্বি আর বোড়োদের বীজ সংরক্ষণ প্রণালী কিন্তু এক নয়, পৃথক।

সঠিকভাবে বীজ না শুকালে বীজতলায় বীজ অংকুরোদগমে সমস্যা হতে পারে। তাই বোড়োরা এই দিকে বেশ ভালোভাবে নজর রাখে। বীজ ধান বা ‘আইজং’ প্রথমবার শোকানোর পর আবার পুনরায় ৩-৪ দিন রোদে শুকিয়ে, ঘরের মেঝেতে রেখে ঠান্ডা করে নেয়। এরপর উপযুক্ত পাত্রে ধান রেখে তা যথাস্থানে সংরক্ষণ করে রাখে। মূলত চটের বস্তা বা পলিপ্যাকে বীজ রাখা হয়। তারপর তা গোলাঘর বা ঘরের এককোণে, মাটি থেকে উচুতে রাখা হয়। এভাবে পোকা-মাকড়ের আক্রমণ থেকে ঐ বীজকে রক্ষা করা যায়। ঐ পাত্রের মধ্যে যদি বায়ু চলাচল করে, তবে ঐ বীজ পোকা ও ছত্রাকের আক্রমণে নষ্ট হয়ে যেতে পারে। তাই তারা পাত্রের মুখ খুব ভালো করে আটকে দেয়।^{২০}



চিত্র নং ১৭ - কার্বিদের ধান বীজ সংরক্ষিত রাখার পাত্র



চিত্র নং ১৮ - কার্বিদের ধান বীজ সংরক্ষিত রাখার কৌশল

কার্বিদের ধান বীজ সংরক্ষণ প্রণালী একেবারে দেশীয় পদ্ধতির জ্বলন্ত উদাহরণ। বীজ ধান নির্বাচন বোড়োদের মতই। এরপর নির্বাচিত ধানকে খুব ভালোভাবে রোদে শোকানো হয়। ধান মাপার জন্য একটা ছোট্ট ঝুড়ি ব্যবহার করে। এই ঝুড়ি বাঁশের দ্বারা নির্মিত। কার্বি ভাষায় একে বলা হয় ‘হ’। এই ‘হ’ দিয়ে পরিমাণ মতো ধান মেপে, সেই ধানের বীজ পাত্রে রাখা হয়। যতটা ধান বীজ হিসাবে রাখা হবে, তা খড়ের তৈরি ‘শকআঠক’ এ রাখা হয়। এই ‘শকআঠক’ হলো ধানের খড় দ্বারা নির্মিত (চিত্র নং- ১৭ ও ১৮)। কেবলমাত্র বীজ ধানই এতে রাখা হয়।

‘শকআঠক’ সৃষ্টিরও একটা লৌকিক পদ্ধতি রয়েছে। প্রথমে গাছের ছাল দিয়ে ‘শকআঠক’-এর খাপাচি বা কাঠামো বানানো হয়। এই খাপাচিকে কার্বি ভাষায় ‘খিংহিরি’ বলে। এই ‘খিংহিরি’র মধ্যে ডালি বোনানোর মতো করে ছয় থেকে আটটি বাঁশের তৈরি ‘চটা’ রাখা হয়। তার ওপর খড় সাজিয়ে দেওয়া হয়। এর মাঝে ধান রাখলে সেই ধানসহ খড় ‘খিংহিরি’র মধ্যে প্রবেশ করে যায়। আর ঐ ‘চটা’গুলির মুখ ওপরে উঠে আসে। এবার ‘চটা’দিয়ে খড়সহ সুন্দরভাবে বেধে ফেলা হয়। বাঁশের তৈরি ‘চটা’কে কার্বি ভাষায় ‘জিংটা’ বলা হয়। বাধার সময় ‘খিংহিরি’ কিছুটা উপরে তুলে নেওয়া হয়। আগামী মরসুমের ধান চাষের জন্য এভাবেই ‘শকআঠক’-এর মধ্যে ধান সংরক্ষণ করে রাখা হয়। বীজধানের পরিমাণ অনুযায়ী ‘শকআঠক’-এর সংখ্যা নির্ধারিত হয়। বীজের পরিমাণ বাড়লে ‘শকআঠক’ সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে।^{২১}

৪.৪. পরম্পরাগত লোকচিকিৎসা প্রণালী ও লোকঔষধ : মানুষের জীবনে রোগ-ভোগ একটা সহজাত ঘটনা। কার্বি এবং বোড়ো জনজাতির মানুষেরা দৈনন্দিন জীবনের এই ধরনের সমস্যা মেটাতে, নিজস্ব ঐতিহ্যগত জ্ঞানকেই কাজে লাগায়। সাধারণভাবে চিকিৎসা-সংক্রান্ত ওষুধ প্রস্তুতের জন্য সনাতন পন্থায়, পরম্পরাগত ঐতিহ্যকে কাজে লাগিয়ে, যে সকল লোকায়ত কৌশল ব্যবহার করা হয় তাকে আমরা লোকচিকিৎসা প্রণালী বলতে পারি। এই প্রণালীতে ব্যবহৃত প্রতিষেধক বা ঔষধকে আমরা লোকঔষধ বলতে পারি। কার্বি এবং বোড়ো জনজাতি দৈনন্দিন

জীবনের নানান সমস্যার জন্য লোকচিকিৎসা প্রণালী এবং লোকঔষধের আশ্রয় নেয়। আমরা এই অংশে কার্বি এবং বোড়ো জনজাতির লোকঔষধ সম্পর্কে আলোচনা করবো।

8.8.1. জ্বর-সর্দি-কাশি হলে ব্যবহৃত লোকঔষধ : জ্বর হলে বোড়োরা ‘অরহল’ গাছের পাতা বেটে কপালে লাগায়। ‘অরহল’ হলো এক ধরনের ডাল জাতীয় শস্য। এছাড়া নাজনে পাতা জলে ‘চুবিয়ে’ কপালে লাগালে জ্বর থেকে উপশম পায়। সর্দি-কাশি হলে বোড়োরা সর্ষের তেলের সাথে রসুন মিশিয়ে গরম করে বুকে লাগায়। এছাড়া বোড়োদের আরাধ্য পৃথিবীর আদিগাছ সিজু গাছের পাতা কলাপাতার মধ্যে মুড়ে ‘কুমল’ আঙুনে ‘সেঁকা’ হয়। এই পাতা কিছুটা ‘সেঁকা’ বা সেদ্ধ হলে তা থেকে রস বের করে মধুর সাথে মিশিয়ে খেলে সর্দি-কাশি থেকে উপশম পাওয়া যায়। কাশি হলে কার্বিরা মধুর সাথে তুলসি পাতা মিশিয়ে খায়।^{২২}

8.8.2. আঘাত লাগলে (মচকে গেলে, হাড় ভাঙলে) : হাড় ভেঙ্গে গেলে ‘হাড় জোড়া’ গাছের পাতা ভালো করে বেটে নিয়ে ভাঙ্গা স্থানে সযত্নে কাপড় বা ঐ জাতীয় কিছু দিয়ে বেধে দেওয়া হয়। এতে ভাঙ্গা হাড় জোড়া লাগে বলে বোড়োদের বিশ্বাস। আর কার্বিরা হাড় ভেঙ্গে গেলে ‘লপুংপ্পে’ গাছের পাতার মিশ্রণ লাগিয়ে তার ওপর বাঁশের বাতা বেধে রাখে (চিত্র নং- ১৯)। আর পা মচকে গেলে বোড়োরা ঐ স্থানে ‘রইসন বেরা’র পাতা বেটে লাগায়। তাছাড়া ঝাড়-ফুক করারও চল রয়েছে বোড়ো সমাজে। হাতে পায়ে ব্যাথা-বেদনা হলে কার্বিরা ‘সাংপুম’ গাছের পাতাতে সর্ষের তেল লাগিয়ে গরম করে মালিস করে। এমনটা করলে ব্যাথা নিরাময় হয়। শরীরের ক্ষতস্থান তাড়াতাড়ি না সারলে কার্বিরা গোসাপের চামড়া রোদে শুকিয়ে গুড়ো করে নারকেল তেলের সাথে মিশিয়ে ক্ষত স্থানে লাগায়। এতে ক্ষত স্থান তাড়াতাড়ি সেরে যায়।^{২৩-২৪}



চিত্র নং ১৯ - লোকঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত ‘লপুংপ্পে’ গাছ

চিত্র নং ২০ - লোকঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত জারমানি

চিত্র নং ২১ - লোকঔষধ হিসাবে ব্যবহৃত কাশিদুরিয়া গাছ

8.8.3. কেটে গেলে : হাত-পা বা শরীরের কোন স্থানে কেটে গেলে বোড়োরা কাটা স্থানে ‘জারমানি’ (চিত্র নং- ২০) ‘তেজপাতা’, ‘বিলোই পাতা’ বেটে লাগায়। লাগালে সাথে সাথে রক্ত পড়া বন্ধ হয়ে যায়। আর কার্বিরা কাটা স্থানে বাঁশের গায়ে লেগে থাকা সাদা আবরণ তুলে ঐ স্থানে লাগায়। এতে করে রক্ত পড়া বন্ধ হয়।^{২৫}

8.8.4. ব্যাথা হলে : দাঁত ব্যাথা হলে বোড়োরা পেয়ারার কচি পাতা ব্যাথা স্থলে দু-তিন দিন দিয়ে রাখে। এতে ব্যাথা কমে যায়। কলাগাছের শিকড় পুড়িয়ে এক ধরনের ছায় প্রস্তুত করা হয়। সেই ছায় দাঁতের গোঁড়ায় লাগিয়েও দাঁতের ব্যাথা কমানো হয়। তাছাড়া তারা কবিরাজ বা ওঝার কাছে গিয়ে ঝাড়-ফুক করে। মাথা ব্যাথা হলে অ্যালোবেরা (শালকোয়ারি)-র পাতার রস কপালে লাগালে মাথা ব্যাথার উপশম হয়। টনসিলে ব্যাথা হলে টগর গাছের ছাল (মির হেরেল) চিবিয়ে খেলে সেরে যায়। এছাড়া কার্বিরা গা-হাত-পায়ে ব্যাথা বেদনা হলে কাসিদুরিয়া গাছের পাতা বেটে লাগায় (চিত্র নং- ২১)।^{২৬-২৭}

৪.৪.৫. জণ্ডিস হলে : জণ্ডিস হলে ‘রিপেসস্বাস’ নামক এক ধরনের লতানো গাছের সাথে কাঁকড় মিশিয়ে খেলে জণ্ডিস সেরে যায়। এটা ১০-১৫ দিন অন্তর খেতে হয়।^{২৮}

সুতরাং জনস্বাস্থ্য সুরক্ষায় চিকিৎসার লৌকিক প্রণালীর ব্যবহারিক উপযোগিতা আজও অনস্বীকার্য। আধুনিক চিকিৎসা প্রণালীর সমান্তরালে, লৌকিক প্রণালীজাত চিকিৎসা পরিসেবা, জনবৃত্তীয় সমাজে ব্যপকভাবে না হলেও তা একেবারে লুপ্ত হয়ে যায়নি। লৌকিক চিকিৎসা প্রণালী আজও ভরসা যুগিয়ে চলছে। আত্মবিশ্বাস উদ্দীপনে (Self Confidence Level) লোকচিকিৎসাবিদ্যা ব্যপকভাবে সফল। যেখানে তথাকথিত আধুনিকতার আলোকচ্ছটা তেমনভাবে অধিকার স্থাপন করেনি, মূলত সেসব জায়গায় প্রাথমিক চিকিৎসা হিসাবে এই ধরনের চিকিৎসা জনজাতির মানুষের আত্মবিশ্বাস উদ্দীপন বাড়াতে ব্যপকভাবে কাজ করে।

৫. কার্ভি ও বোড়ো জনজাতির ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের সঙ্কট ও সম্ভাবনার নানা দিক : আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসূত সমাজ সংস্পর্শ, আধুনিক এবং সনাতন জীবনধারার মধ্যে একটা অদৃশ্য দেওয়াল তুলে দেয়। সম্ভোগলিপ্সু জনগণসহ যাঁরা সাধারণ সম্ভোগী তাঁরাও আজ আধুনিকতার পূজারী। সমাজ-সংস্কৃতি আজ অসহায়, আক্রান্ত। দেশজ ভাবনাজাত চিন্তন-জগত আজ বিব্রত এবং ক্রুদ্ধ, যার কারণে সমাজ-সংস্কৃতির বিভিন্ন ক্ষেত্রে দেখা দিচ্ছে জটিলতা এবং সঙ্কট। সম্ভোগলিপ্সু হন আর নিসম্ভোগী মানুষ হন, প্রত্যেকেরই সমাজের কাছে একটা প্রত্যাশা আছে। সেই প্রত্যাশাজাত চাহিদা আজ এমন জায়গায় পৌঁছেছে যে, তা বর্তমান সমস্যার সৃজন করছে। আসলে এই সমস্যা সমাজ-সংস্কৃতির সঙ্কটময় দ্যোতক নাকি তার বিবর্তন, এই বিতর্কে প্রবেশ না করেও বলা যায়— সমাজ তার সাবেকি রূপ হারিয়ে নবরূপ ধারণ করেছে, যার নির্যাসে আর যা কিছু থাক, দেশজ ভাবনা ও চিন্তন পরিসর আজ অনেক কম। কার্ভি ও বোড়ো জনজাতির ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানও আজ এই সংস্পর্শ থেকে দূরে নয়। আমরা এই প্রেক্ষিতে বিষয়টি বুঝে নেবার চেষ্টা করবো।

৫.১. সঙ্কটের নানা দিক : মূলত সমাজের মোড়লগণ বা প্রবীণ সমাজ ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের সম্প্রসারক। তাঁদের অনুপস্থিতি সমাজে বড়ো ধরনের সমস্যা সৃজন করতে পারে। তাই সকলের এই বিষয়ে বিশেষভাবে নজর দেওয়া উচিত। এই দায়বদ্ধতা যেমন সংশ্লিষ্ট সমাজের নবীন ও প্রবীণ উভয়েরই, তেমনি লোকসংস্কৃতির গবেষকগণও এক্ষেত্রে বিশেষ ভূমিকা নির্বাহ করতে পারে। আমরা এই প্রেক্ষিতে একটি বিষয়ের অবতারণা করতে চাই। লোকসংস্কৃতির গবেষকগণের এই বিষয়সমূহের দিকে আরোও বেশি করে নজর দেবার অবকাশ রয়েছে। আসলে লোকসংস্কৃতির গবেষকগণ এক্ষেত্রে সমাজ সেবকের কাজ করতে পারেন। অর্থাৎ আমরা লোকসংস্কৃতির গবেষকদের Social Activist Folklorist-র ভূমিকার কথা উল্লেখ করতে চাচ্ছি। বেশি বেশি করে সংশ্লিষ্ট বিষয় নিয়ে লেখা-লিখি, প্রচার করে জনজাতির আত্মজ গরিমা সম্পর্কে সচেতন করতে পারেন।

সমাজ-সংস্কৃতি-অর্থনীতির পরিকাঠামোর সঙ্গে ঐতিহ্য এমনভাবে সম্পৃক্ত যে এদের মধ্যে যেকোনো একটা কিছুর পরিবর্তনের সাথে সাথে ঐতিহ্যও পরিবর্তিত হয়ে থাকে এবং তা ধারাবাহিকভাবেই চলছে। স্বাভাবিকভাবে তা আমাদের দৃষ্টিগোচর নয়। কেও কেও আবার এই পরিবর্তনকে পরিবর্তন না বলে রূপান্তর বলার পক্ষ্যপাতি। পরিবর্তন বা রূপান্তর যাই বলি না কেনো এর যেমন ভালো দিক আছে, তেমন উল্টোটাও লক্ষ্য করা যায়। ঐতিহ্য-গরিমা ধরে না রাখার পশ্চাতে রয়েছে নানাবিধ কারণ। একদিকে যেমন রয়েছে প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব। অন্যদিকে আজকাল নবীনদের মধ্যে স্ব-সংস্কৃতির প্রতি একটা অবহেলা ভাব পরিলক্ষিত। সমীক্ষিত অঞ্চলে গিয়ে দেখি চিকিৎসার যে লৌকিক প্রণালী তা কেবল গ্রামের প্রবীণদের মধ্যেই প্রবাহমান। যুবক-যুবতীদের এই বিষয়গুলির প্রতি তেমনভাবে সমাদর লক্ষ্য করা যায় না। তাঁরা অনেক বেশি আধুনিক পন্থী। প্রাচীনত্ব বা সেকালের ভাবনা তাঁদের বাস্তব জীবনাচারণের পক্ষ্যে পরিপন্থী। কখনো কখনো নবীনরাও দেশজ ভাবনার আশ্রয় নিয়ে থাকে। তাও আবার আধুনিক চিকিৎসাবিদ্যার অপ্রতুলতার সূত্রে।

প্রজন্মগত দ্বন্দ্ব যেকোনো স্থানের যেকোনো সমাজেই লক্ষ্য করা যায়। এই দ্বন্দ্ব সৃষ্টির সমাজ-মনোস্কৃত্ত্বগত কিছু কারণ রয়েছে। সমাজ-মনোস্কৃত্ত্বের পাশাপাশি সম্ভোগলিপ্সু জীবনাচরণে যখন আধুনিকতার হাঙ্কা প্রলেপ পড়ে এবং তা যখন যুব সমাজ গ্রহণ করে, তখন তাদের সাথে প্রবীণদের মানসিক দূরত্ব অনেক বেশি হয়ে যায়। নবীন-প্রবীণের মনন অভিজ্ঞতার আদান-প্রদানের প্রতিবেশ খুব কম গড়ে ওঠে। ফলে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের স্থানান্তর খুব কম হয়। এই বিষয়টি অন্যান্য সমাজের মতো অসমের কার্ভি ও বোড়ো জনজাতির মধ্যেও বিশেষ মাত্রায় লক্ষ্য করা যাচ্ছে। বর্তমান সময়ে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানবীজ প্রতিস্থাপনের সুযোগ খুব কম হচ্ছে এবং সেই প্রতিবেশও গড়ে উঠছে না। ফলে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের বিস্তার স্থান অনেকটায় কমে যাচ্ছে। অনেক সময় প্রকৃতিগত কারণও প্রভাবক হিসাবে কাজ করে। সরকারী-বেসরকারী পৃষ্ঠপোষকতা, সম্মান ও কদর যদি লক্ষ্য করা যায়, তবে সাংস্কৃতিক প্রতিরোধ গড়ে তোলা সম্ভব।

৫.২. সম্ভাবনার নানা দিক : অসমের কার্ভি ও বোড়ো জনজাতির ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের সজীবতা রয়েছে— তা আমরা লক্ষ্য করেছি। আনন্দের বিষয় হল— এই জনসমাজ এখনো পর্যন্ত দৈনন্দিন জীবনাচরণে দেশজ ভাবনা সম্পৃক্ত জীবনাচর্যাকেই বেশি প্রাধান্য দিয়ে আসছে। বিভিন্ন ক্ষেত্রে আজও ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানই তাঁদের একমাত্র ভরসা। অসমের জনজাতিসমূহ দৈনন্দিন জীবনাচরণে প্রায় প্রত্যেক মুহূর্তে স্বজাতিগত নিজস্বতাকে তুলে ধরে। এই ব্যবহারের যেমন বৈচিত্র্য রয়েছে, তেমনি বৈচিত্র্য রয়েছে স্বজাতিগত নিজস্বতার। অসমের ক্ষেত্রী এলাকার কার্ভি ও বোড়ো জনজাতিদ্বয়ের মানুষের মধ্যে খাদ্য প্রস্তুতকরণ থেকে শুরু করে, পানীয় সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, খাদ্যশস্য সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, জ্বালানী সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহৃত বিভিন্ন উপাদান সংগ্রহ ও সংরক্ষণ এবং গৃহনির্মাণ শৈলী, পশু শিকারকালীন, কৃষিকাজে ব্যবহৃত— ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের ব্যবহারিক ও সামাজিক উপযোগিতা রয়েছে। নিজস্ব প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র এঁরা নিজেই প্রস্তুত করে। নবীন প্রজন্মের একটা অনীহা কাজ করলেও তা কিন্তু এখনো প্রখর মাত্রা পায়নি। সব মিলিয়ে সংশ্লিষ্ট জনজাতি ঐতিহ্য-গরিমা ধরে রাখার পক্ষেই সওয়াল করে। ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের ব্যবহারিক ও সামাজিক উপযোগিতার দিকে তাকিয়ে আমাদের তেমনটায় মনে হয়েছে। এতে করে জনজাতিদ্বয়ের আর একটি দিক উঠে এসেছে— তা হল দেশজ জীবন-যাপনের তাগিদ। লোকসংস্কৃতির প্রাণ-প্রবাহমানতা এখনও সচল— এই তাগিদ তারই স্বাক্ষরবাহী। এঁরা অতি মাত্রায় দেশজ জীবন-যাপনের পক্ষে। যার ফলে প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের ভাঙন রোধ হচ্ছে। জনজাতির নিজস্ব ভাবনাজাত অভিজ্ঞতা প্রতিস্থাপনের প্রতিবেশ গড়ে তুলতে পারলে আরোও ভালো হয়।

৬. কার্ভি ও বোড়ো জনজীবনে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের ব্যবহারিক গুরুত্ব : জনজাতির দৈনন্দিন জীবনাচরণ, মনন তথা সুদীর্ঘকালের ধারাবাহিক জীবনাচরণের ভিত্তিতেই গড়ে উঠেছে চিরায়ত এই লোকঐতিহ্যজাত জ্ঞান। বিভিন্ন জনজাতি ও জনসাধারণের মতো কার্ভি ও বোড়ো জনজীবনেও সামাজিক নিয়ম-কানুনগুলির মধ্যে বিভিন্ন সংস্কারগুলি বিশেষভাবে ধরা পড়ে। এই সংস্কারসমূহের মধ্যেও সজীব রয়েছে নানাবিধ ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞান, যার সামাজিক প্রাসঙ্গিকতা অনস্বীকার্য। পূর্বপুরুষদের ঐতিহ্য, সামাজিক প্রথা পালন একদিকে যেমন ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের সজীবতাকে নানা প্রতিকূলতার মধ্যে অক্ষুন্ন রেখেছে, তেমনি প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে লোকসংস্কৃতির পুনরুজ্জীবনেও বিশেষভাবে সহযোগিতা করেছে এবং করছে। ভবিষ্যতে কি হবে তা ভবিষ্যতের নিয়মে ছেড়ে দিয়েও বলা যায় ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের প্রাসঙ্গিকতাকে অস্বীকার করার উপায় নেই। সামাজিক দায়বদ্ধতা ও উত্তরাধিকার সূত্রেই তা বিভিন্ন সময়ে অত্যধিক গুরুত্ব পেয়ে আসছে। 'শিকড়' অন্বেষণে - কখনও ব্যক্তিক উদ্যোগে, পূর্বপুরুষ ইতিবৃত্তায়নে, স্মৃতিচারণায়, কখনও সামাজিক টানে আবার কখনো বা সহজ প্রতুলতায় ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের ভাঙরকে আজও অবিচল রেখেছে। ফলে আজও এর প্রয়োজনীয়তা ব্যাপকভাবে দৃশ্যমান।

ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞান ব্যবহারের ক্ষেত্রে বিশেষভাবে প্রতিক্রিয়া করে উত্তরাধিকারজাত জাতীয়তাবাদী চেতনা। এলাকার প্রবীণ, প্রতিনিধি স্থানীয় ব্যক্তিত্ব, পিতা-মাতা, আত্মীয় পরিজনদের নিয়ে যে প্রতিবেশ গড়ে ওঠে, সেই সমাজের

সংস্পর্শে সন্তান-সন্ততিদের মানসিক পরিকাঠামো জগত গড়ে ওঠে। তখন ঐ যুবসমাজ উত্তরাধিকারজাত দেশজ সুলভ জীবন-যাপনে আগ্রহ প্রকাশ করে। উত্তরাধিকার ভাবনাজাত অভিজ্ঞতা তাঁদের মধ্যে প্রতিস্থাপিত হয়। তারাও সেই ধারাকে ধরে রাখার চেষ্টা করে। এঁরা ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞান-ভাবনা ব্যবহারে বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করে। অনেক বেশি একাত্ম অনুভব করে। এভাবেও গরিমাময় দেশজ্ঞান অবলুপ্তির হাত থেকে রক্ষা পায় এবং সমাজের নানাবিধ সমস্যার সমাধান সাধন করে।

কার্ভি ও বোড়ো জনজাতির মানুষেরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনবিরল অঞ্চলে বসবাস করে। অনেক সময় তথাকথিত আধুনিক সমাজের সংস্পর্শ পায় না। যে কারণে তাঁরা লোকায়ত জ্ঞান সম্পৃক্ত বা ঐতিহ্যশ্রয়ী জীবন-যাপনে অনেক বেশি নির্ভরশীল। তাছাড়া অন্যান্য উপাদান অপেক্ষা লোকায়ত উপাদান অনেক বেশি সহজলভ্য। হাতের কাছে সর্বদা পাওয়া যায়। অর্থনৈতিক দিক থেকে দেখলে বলা যায়, সনাতন জ্ঞানের আশ্রয় নেওয়ার ফলে জনজাতির টাকা-পয়সা অনেক বেশি সাশ্রয় হয়। অর্থাৎ সমাজ অর্থনৈতিক পরিকাঠামোয় দেশজ জ্ঞানের অবস্থিতি বিশেষ গুরুত্ব পেতে পারে। দেশজ সুলভ জীবন-যাপনে অনেক সময় সামাজিক দায়বদ্ধতাগত অনুভূতি ক্রিয়া করে। তার ফলে জনবৃন্দের মধ্যে স্বজাত ঐতিহ্য রক্ষার তাগিদ লক্ষ্য করা যায়। তাঁরা অনেকেই মনে করেন এসমস্ত কিছু তাদের একান্তভাবেই নিজের এবং তা রক্ষার দায়-দায়িত্ব স্বাভিমানের পরিচায়ক।

নানাবিধ ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞান কেবলমাত্র লৌকিক বা সংস্কারসমূহের সমাহার নয়, এর মধ্যে যথেষ্ট পরিমাণ যুক্তি ও বৈজ্ঞানিক সত্ত্বার অবস্থান দেখা যায়। আধুনিকতার অতলস্পর্শী আবেদনকে অস্বীকার করেও যে আজ স্বমহিমায় জাজ্বল্যমান, তা আর যাইহোক কেবলমাত্র সংস্কার বা অবৈজ্ঞানিক সত্ত্বার ওপর নির্ভর করে সজীব থাকতে পারে না। এর মধ্যে অবশ্যই যুক্তি ও বিজ্ঞান রয়েছে, যে সত্ত্বার ওপর নির্ভর করেই সমাজ-জীবনের নানাবিধ সমস্যা সমাধান সাধিত হয়। যে কারণে আজও সমাজ লোকজ্ঞানের গুরুত্বকে মহিমাষিত করে রেখেছে। বিভিন্ন জনসমাজ, দৈনন্দিন জীবনাচারনে ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানকে মুসিয়ানার সঙ্গে ব্যবহার ও প্রয়োগ করে আসছে।

৭. উপসংহার : একটা সময় সারা পৃথিবী জুড়ে বিশ্বায়নের পিছনে ধাওয়া করার হিড়িক পড়ে গিয়েছিল। এখন আবার শুরু হয়েছে শিকড়ে ফেরার। তবে দৃষ্টিভঙ্গী পাল্টেছে। বিশ্বায়নকে সঙ্গে রেখে নিজেকে জানার আকাঙ্ক্ষা পুনরায় মানুষকে শিকড়ের সন্ধানে ফিরিয়েছে। একটা সময় প্রযুক্তি ছাড়াই সারা বিশ্ব নিয়ন্ত্রিত হয়েছে। এখন কিন্তু সময় ও ভাবধারা দুই পাল্টেছে। এখন প্রযুক্তি দ্বারা বিশ্ব ও বিশ্বায়ন নিয়ন্ত্রিত হচ্ছে। অনেকের অভিমত বিশ্বায়নের প্রভাবে সংস্কৃতি আজ চরমভাবে বিপর্যস্ত। ত্রিস্তরীয় (পরিশীলিত, লোক এবং আদিবাসী) সমাজ ব্যবস্থায় প্রথম দু'টি স্তর মোটামুটি ভাবে বিশ্বায়নের প্রভাবে প্রভাবিত। অপেক্ষাকৃত জনজাতি সমাজ (Tribal Society) কম প্রভাবিত। এঁরা সনাতন ভাবধারাকে আঁকড়ে ধরে ছিল, আজও অনেকাংশে তা ধরে রাখতে সচেষ্ট। আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা অপেক্ষা লোকায়ত জ্ঞান ব্যবহার করতেই এঁরা বেশি স্বচ্ছন্দবোধ করেন। তাছাড়া এই জনজাতিরা বেশিরভাগ ক্ষেত্রে জনবিরল অঞ্চলে বসবাস করায়, অনেক সময় আধুনিক প্রযুক্তিবিদ্যা প্রসূত সমাজ সংস্পর্শ থেকে অনেক দূরে অবস্থান করে। ফলে তাঁরা লোকায়ত জ্ঞান সম্পৃক্ত বা ঐতিহ্যশ্রয়ী জীবনযাপনে নির্ভরশীল। তাছাড়া বিভিন্ন ক্ষেত্রে প্রমাণিত - অন্যান্য জনসাধারণ অপেক্ষা জনজাতিরা (Tribe) ঐতিহ্যশ্রয়ী জীবন-যাপনে বেশি অভ্যস্ত। দেশজ জীবন-যাপনের আলাদা তাগিদ লক্ষ্য করা যায় তাঁদের মধ্যে। ঐতিহ্যশ্রয়ী জীবন-যাপন যেন এঁদের শোণিত ধারায় সম্পৃক্ত। আমাদের আলোচনার বৃন্দের বাইরে বেরিয়ে বলা যায়— বিভিন্ন লোকভিকরণশিল্প প্রদর্শন, উৎসবাদি, বুনন শিল্প ইত্যাদি ক্ষেত্রেও স্বাভিমানের স্পর্শ রয়েছে। অনেক সময় জনজাতিরা কেবলমাত্র ঐতিহ্যশ্রয়ী জ্ঞানের ওপর নির্ভরশীল জীবন-যাপন করে। কৃষিকাজ কেন্দ্রিক, বিভিন্ন জিনিসপত্র সংগ্রহ ও সংরক্ষণে পরাম্পরাগত জ্ঞানের আশ্রয় নিয়ে থাকেন। বেশিরভাগ ক্ষেত্রে এই জ্ঞানের ধারক ও বাহক হিসাবে গ্রামের প্রবীণদেরকে চিহ্নিত করা হয়। তাঁদের অনুপস্থিতিতে ভাবৈশ্বর্যময় এই দেশজ্ঞান অবলুপ্তির পথ খুঁজে নিতে পারে। সংশ্লিষ্ট সমাজের যুবকরা এখন অনেক বেশি আধুনিক। এঁদের চাল-চলন, জীবন ধারায় এসেছে অনেক বেশি পরিবর্তন। তাঁরা বেশিরভাগ সময় নিজস্ব ভাব,

ঐতিহ্য-গৰিমা ধৰে রাখতে সচেষ্টি নয়। এ বিষয়ে যুবসমাজেৰ আৰোও বেশি সচেতন হ'বাব দৰকাৰ। প্ৰয়োজনে এলাকাৰ প্ৰবীণ সমাজ আলাদা প্ৰতিবেশ গড়ে, যুবসমাজকে দেশজ সুলভ জীবন-যাপনে আগ্ৰহী করে তুলতে পাবেন। নিজস্ব ভাবনাজাত অভিজ্ঞতাকে তাঁদের মধ্যে প্ৰতিস্থাপিত করে গৰিমাময় দেশজ্ঞানকে অবলুপ্তিৰ হাত থেকে রক্ষা করা সম্ভব।

তথ্যসূত্ৰ :

১. টেৰন, তেজাল, অলিখিত কাৰ্বি ইতিহাস অন্বেষণ, কাৰ্বি আংলাং জিলা সাহিত্য সভা, ডিফু, ২০১০, পৃ. ১৫ (মুদ্ৰিত)
২. তথ্যদাতা : ৰোহিণী বোড়ো, বয়স-৩৯, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
৩. তথ্যদাতা : কৰণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
৪. তথ্যদাতা : মঞ্জুলাতুমুঙ, বয়স-৩২, গ্ৰাম- তেতেলি গুড়ি, পোঃ গান্ধীনগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
৫. তথ্যদাতা : পুৰ্ণিমা বনজাং, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধীনগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
৬. তথ্যদাতা : ৰস্তা তেৰন, বয়স- ৫৫, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
৭. তথ্যদাতা : ভাৰতী দেওমাৰী, বয়স - ৪৫, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
৮. তথ্যদাতা : শেওয়ালি বোৰো, বয়স - ৩২, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
৯. তথ্যদাতা : কৰণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
১০. তথ্যদাতা : দত্ত বোৰো, বয়স - ৪০, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
১১. তথ্যদাতা : কবিতা দেওমাৰী, বয়স-৩৫, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
১২. তথ্যদাতা : কৰণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
১৩. তথ্যদাতা : তুতু মনি বসুমাতাৰি, বয়স-৩৭, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
১৪. তথ্যদাতা : কৰণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
১৫. তথ্যদাতা : তুতু মনি বসুমাতাৰি, বয়স-৩৭, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
১৬. তথ্যদাতা : কৰণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬

১৭. তথ্যদাতা : কৰণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
১৮. তথ্যদাতা : হৰগৌৰি ৰামসারি, বয়স-৫১, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ , পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
১৯. তথ্যদাতা : হৰগৌৰি ৰামসারি, বয়স-৫১, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ , পোঃ টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
- ২০ তথ্যদাতা : ধীৰেন ৰায়, বয়স-৪৫, গ্ৰাম- শান্তিপুৰ, পোঃ- টোপাতুলি, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৫.০৪.১৬
২১. তথ্যদাতা : কৰণ সিং রংহান, বয়স-৩৮, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
২২. তথ্যদাতা : ৰম্ভা তেরন, বয়স- ৫৫, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
২৩. তথ্যদাতা : লুইত ৰোহাং, বয়স-৭১, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
২৪. তথ্যদাতা : ফুলেশ্বৰী কাথার, বয়স-৬০, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধীনগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
২৫. তথ্যদাতা : লুইত ৰোহাং, বয়স-৭১, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
২৬. তথ্যদাতা : লুইত ৰোহাং, বয়স-৭১, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
২৭. তথ্যদাতা : ফুলেশ্বৰী কাথার, বয়স-৬০, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধীনগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬
২৮. তথ্যদাতা : লুইত ৰোহাং, বয়স-৭১, গ্ৰাম- তেতেলিগুড়ি, পোঃ গান্ধী নগৰ, থানা- ক্ষেত্ৰী, কামৰূপ মহানগৰ, অসম, তাৰিখ - ০৬.০৪.১৬